গঞ্জের মানুষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥গঞ্জের মানুষ॥

রাজা ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর দিনটা শেষ হয়ে গেল। একটা একা শিরীষ গাছ সিকি মাইল লম্বা ছায়া ফেলেছিল। সেই ছায়াটাকে গিলে ফেলল আঁধার রাতের বিশাল পাখির ছায়া। ফকিরচাঁদের সাত ঘড়া মোহর আর বিস্তর সোনাদানা, হিরে-জহরত সব ওই ঢিবির ভিতরে পোঁতা আছে। আর আছে ফকিরচাঁদের আস্ত বসতবাড়িটা। ঢিবির ওপাশ দিয়ে রেললাইন, এপাশ দিয়ে রাস্তা। পাথরকুচি ছড়ানো, গাছগাছালির ছায়ায় ভরা। এখন একটু অন্ধকার মতো হয়ে এসেছে, শীতের থম-ধরা বিকেলে একটু ধোঁয়াটে মতো চারধার। রাস্তার পাথরকুচিতে চটি ঘষটানোর শব্দ উঠছে। রবারের হাওয়াই চটি, এ পর্যন্ত সাতবার ছিঁড়েছে। তবু ফেলে দেয়নি নদীয়াকুমার।

তো এই সন্ধের ঝোঁকে আলো-আঁধারে নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায় তা ঠাহর করা মুশকিল। ভেলুরামের চোখে ছানি আসছে। নাতি খেলারাম বীরপাড়া গেছে তাগাদায়। সে এখনও ফেরেনি দেখে চৌপথীতে গিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে এল ভেলু। বীরপাড়ার একটা বাস এসে ছেড়ে গেল। এ-গাড়িতেও আসেনি। আরও খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে হত। নাতিটার জন্য বড্ড চিন্তাভাবনা তার। কিন্তু ভেলুরাম দোকান ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে ভরসা পায় না। তার ছেলে শোভারাম চোর-চোট্টা-বদমাশ হয়ে গেছে। এক নম্বরের হেক্কোড়। নেশাভাঙ আর আউরাৎ নিয়ে কারবার করে। বহুকাল আগে শোভারামের বউ পালিয়ে গেছে। ভেলু কেবল নাতিটাকে রেখে শোভারামকেও ঘরের বার করেছে। কিন্তু ছেলে মহা হেক্কোড়, দুনিয়ায় কাউকে ভয় পায় না। দরকার পড়লেই এসে ভেলুর দোকানে হামলা করে মালকড়ি ঝেঁকে নিয়ে যায়। তাই চৌপথী থেকে পা চালিয়ে ফিরছিল ভেলু। রবারের চটির আওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

নদীয়া যায়, না নদীয়ার বউ যায়? মুশকিল হল, নদীয়ার বউ আজকাল মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, পিরান গায়ে দেয়, চুলও ছেঁটে ফেলেছে। কে বলবে মেয়েমানুষ? হাতে চুড়ি-বালা সিঁথের সিঁদুর কিছু নেই। রাতবিরেতে লোকালয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা হয়েছে যে, সে পুরুষমানুষ, আর কালীসাধক। অবশ্য কালীর ভরও হয় তার ওপর। শুধু ভেলু কেন, গঞ্জের সবাই নদীয়ার বউকে ভয় খায়। নদীয়া নিজেও।

ভেলু শেষবেলার আকাশের খয়াটে আলোটুকুও চোখে সহ্য করতে পারে না, চোখে হাত আড়াল দিয়ে দেখে বুঝে ভয়ে-ভয়ে বলে—কে, নদীয়া নাকি?

—হয়। নদীয়া উত্তর দিল।

—কোন বাগে যাচ্ছ?

—বাজারের দিকেই।

–চলো, একসঙ্গে যাই।

–চলো।

দুজনে একসঙ্গে হাঁটে। ভেলুরামের নাগরা জুতোর ঠনাঠন শব্দ হচ্ছে, ফ্যাসফ্যাস করছে নদীয়ার চটি। ভারী দুঃখী মানুষ এই নদীয়া। বউ যদি পুরুষছেলে হয়ে যায় তো পুরুষমানুষের দুঃখ ঝুড়িভরা। কিন্তু ওই সাত জায়গায় ডিম-সুতোর বাঁধনওয়ালা হাওয়াই চটি দেখে যদি কেউ নদীয়ার দুঃখ বুঝবার চেষ্টা করে তো সে আহাম্মক। নদীয়ার দুঃখ ওই চটি জুতোয় নয় মোটেই। দু-দুটো মদ্দ হালুইকর নদীয়ার শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে দু-বেলা খাটে। গঞ্জে বলতে গেলে ওই একটাই মিষ্টির দোকান। আরও কয়েকটা নদীয়ার ভাত মারবার জন্য গজিয়েছে বটে, তবু নদীয়ার বিক্রিবাটাই সবচেয়ে বেশি। দোষের মধ্যে লোকটা কৃপণ। জামাটা জুতোটা কিনবে না, পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোবে না। চটি ছিঁড়লে সেলাই করে পরবে। বউ কি সাধে পুরুষ সাজে!

যে যার নিজের জ্বালায় মরে। নদীয়া যেতে-যেতে কাঁদুনি গাইতে লাগল–সামনের অমাবস্যায় আমার বাড়িতে মচ্ছব লাগবে, বুঝেছ? আমার বউ নিজের হাতে পাঁঠা কাটবে। শুনেছ কখনও মেয়েছেলে পাঁঠা কাটে?

দেহাতি ভেলুরামের তিন পুরুষের বাস এই গঞ্জে। সে পুরো বাঙালি হয়ে গেছে, তবু মাঝে-মাঝে অভ্যাস রাখার জন্য সে দু-চারটে হিন্দি কথা ভেজাল দিয়ে নির্ভুল বাংলা বলে। যেমন এখন বলল–নদীয়া ভাই, আউরাৎ তোমার কোথায়? ও তো ব্যাটাছেলে হয়ে গেছে। সোচো মাৎ।

BANGLADARSHAN.COM

–তুমি তো বলবেই। আমি মরি স্বখাত সলিলে, তোমরা মাগনার মজা দেখছ।

ভেলুরাম নাগরার শব্দে যথেষ্ট পৌরুষ ফুটিয়ে বলল–ও মেয়েছেলেকে সোজা রাখতে হলে চার জুতি লাগাতে হয়।

বলে থেমে গিয়ে নিজের একখানা পা তুলে পায়ের নাগরা নদীয়াকুমারকে দেখিয়ে বলল–এইসন জুতি চাই। কিন্তু তুমি জুতি লাগাবে কি, তোমার তো একজোড়া ভালো জুতিই নেই। ওইরকম কুত্তার কানের মতো লটরপটর হাওয়াই চটি দিয়ে কি জুতো মারা যায়!

–রাখো-রাখো! নদীয়া ধমকে ওঠে–শোভারামের মা যখন নোড়া তুলে তাড়া করেছিল তখন তো বাপু ন্যাজ দেখিয়েছিলে, বুড়ো ভাম কোথাকার!

ভেলুরাম খুব হাসে। শোভারামের মা এখন আর বেঁচে নেই। নোড়া নিয়ে তাড়া করার সেই সুখস্মৃতিতে ভারী আহ্লাদ আসে মনে। এত আহ্লাদ যে চোখে জল এসে যায় ভেলুরামের।

আনাচে-কানাচে শোভারাম কুকুর-বেড়ালের মতো ঘুরঘুর করে। এমন অবস্থা ছিল না যখন মা গন্ধেশ্বরী জীবিত ছিল। তখনও বাপটা খড়মটা হুড়কোটা দিয়ে পেটাত বটে, কিন্তু তবু সংসারের বার করতে সাহস পেত না। মা গন্ধেশ্বরীকে ভূত-প্রেত পর্যন্ত ভয় পেত, কাবুলিওয়ালা কি দারোগা পুলিশকেও গ্রাহ্য করত না গন্ধেশ্বরী।

ভেলুরাম তো সেই তুলনায় ছারপোকা। সেই গন্ধেশ্বরী ছিল শোভারামের সহায়। তখন শোভারামের মনখানা সবসময়ে এই গান গাইত—লুট পড়েছে, লুটের বাহার লুটে নে রে তোরা। তাই বটে। বাপ ভেলুরামের পাইকারি মশলাপাতি, মনোহারি জিনিসপাট, তামাকপাতা, তেলের বীজ ইত্যাদির কারবার থেকে সে মনের আনন্দে লুট করত। বখা ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে শিখেছিল ইস্কুলের প্রথম দিকটায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে লেখাপড়া সাঙ্গ হল। মাস্টাররা মারে বলে মা গন্ধেশ্বরী ইস্কুল থেকে ছাড়ান করাল। বাপের সঙ্গে কিছুদিন কারবার বুঝবার চেষ্টায় লেগেছিল। ভালো লাগত না। বাপটা পারেও বটে। দু-পয়সা চার পয়সার হিসেব নিয়ে পর্যন্ত মাথা গরম করত। শোভারামের এসব পোষায় না। বয়সকালে বউকে গাওনা করে দেহাত থেকে আনাল মা। কিন্তু সে বউয়েরও কি যা ছিল! শোভারাম ইতিমধ্যে বখাটেরদের সঙ্গে ভিড়ে বিস্তর মেয়েমানুষের স্বাদ সংগ্রহ করেছে। দেহাতি মেয়ে বড্ড নোনতা। ভারী ঝাঁঝ তাদের হাবেভাবে। সেটা অপছন্দ ছিল না শোভারামের। কিন্তু বউয়েরও তো পছন্দ বলে কিছু আছে! শোভারাম নেশার ঘোরে পড়ে গেছে, গাঁজা ভাঙ তো আছেই, বোতলের নেশাও ধরে ফেলেছে কবে। মেয়েমানুষটা টিকটিক করত। খেলারাম হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম। মা গন্ধেশ্বরী তখনও সহায়। ছেলের বউয়ের তেজ দেখে উদুখলের কোঁৎকাটা দিয়ে আচ্ছাসে ঝেড়ে দিল। সেই পেটানো দেখে শোভারাম মুগ্ধ। মায়ের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়েছিল সেদিন। বছরখানেকের খেলারামকে ফেলে বউ ভেগে গেল ছ'মাস পর। বাপ ভেলু অবশ্য বরাবরই শোভার বিপক্ষে। তক্কে-তক্কে ছিল, কবে গন্ধেশ্বরী মরে। সেই ইচ্ছা পূরণ করে শোভারামকে জগৎসংসারে একেবারে দিগদারির দরিয়ায় ছেড়ে, গেল বছর মা গন্ধেশ্বরী সধবা মরল। গন্ধেশ্বরীর শ্রাদ্ধের দিন পার হতে-না-হতেই ভেলুরাম মহা হাঙ্গামা বাদায়। শোভারাম কিছু প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু বাপ ভেলুরাম মহকুমায় গিয়ে এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে দরবার করে। লজ্জায় ঘেন্নার শোভারাম গৃহত্যাগ করে।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু ঘর ছাড়লেই কী! তিরপাইয়ের বস্তিতে জগনের ঘরে একরকম আদরেই আছে শোভারাম। কিন্তু সে আদরে তো মালকড়ি আসে না। নেশা-ভাঙ আর কাঁহাতক ভিক্ষেসিক্ষে করে চলে! কাজবাজ বলতে কিছু নেই, রোজগাড়পাতি ঢুঢু, চুরি-চামারিও বড় সহজ নয়। মহকুমার সদরে গিয়ে অনেক ঘুরঘুর করেছে সে, কেউ কাজ দেয় না। তিন-চার বাড়িতে চাকর খেটেছিল, চুরি করে মারধর খেয়ে পালিয়ে এসেছে, পুলিশও খোঁজখবর করছে। বড় অব্যবস্থা চারদিকে। চুরির লাইনে পাকাপাকিভাবে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল। কিন্তু নেশা-ভাঙ করে শরীরে আর রস নেই, হাতটাত কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে, মাথা গুলিয়ে যায়। মদনা চোরকে দেখে বুঝেছে যে চুরিও বড় সহজ কাজ নয়। সংযম চাই, ত্যাগ চাই, আত্মবিশ্বাস আর বুদ্ধি চাই। মদনা রোজ সকালে ব্যায়াম করে, ঘোড়ার মতো ছোলা খায়, নেশাটেশাও বুঝে-সমঝে করে। তা ছাড়া সে নানান মন্ত্র জানে। ভূতপ্রেত তাড়ানোর মন্ত্র, কুকুরের মুখবন্ধন, ঘুমপাড়ানি মন্ত্র মদনা যে আজ বড় চোর হয়েছে সে-ও মাগনা নয়। যে দিকেই বড় হতে চাও কিছু গুণ থাকাই লাগবে। শোভারামের কিছু নেই।

তাই শেষপর্যন্ত ফের ভেলুরামের গদিতেই তাকে মাঝে-মাঝে চড়াও হতে হয়। কাকুতি মিনিতেতে আজ কাল কাজ হয় না, চোখ রাঙালে হয়। ভেলুরাম তার ধাত বুঝে গেছে। খেলারাম বাপকে দূর-দূর করে। একটা

বিলিতি কুত্তা রেখেছে, সেইটিকে লেলিয়ে দেয়। তবু দু-পাঁচ টাকা ওই বাপ কি ছেলেই ছুড়ে দেয় শোভারামকে আজও। সেই অপমানের পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে আসে শোভারাম। চোখে জল আসে। তারই বাপ, তারই ছেলে, পয়সাও হক্কের, তবু ভিক্ষে করে আনতে হয়।

আজও গদির চারধারে ঘুরঘুর করে বাতাস শুঁকছিল শোভারাম। মশলাপাতির একটা ঝাঁঝালো গন্ধ এখানে। বাজারের পিছন সারির দোকান আর গুদামের জায়গাটা খুব নির্জন। খেলারামের কুকুরটা কাঠের দোতলার বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচাচ্ছে। শোভারাম মুখ তুলে কুকুরটাকে দেখল। ভীষণ কুকুর। বলল—কুত্তার বাচ্চা কোথাকার!

গদিতে খেলা বা ভেলু কেউ নেই। শুধু বুড়ো কর্মচারী বসে হিসেবের লাল খাতা খুলে শক্ত যোগ অঙ্ক কষছে। দু-চারজন খদ্দের মশা তাড়াচ্ছে। আর খেলারামের মাস্টার শ্রীপতি কর্মকার বসে আছে উদাসভাবে। শ্রীপতি মাস্টার লোকটি বড় ভালো। সারাদিন বসে কি যেন ভাবে। লোকে বলে গঞ্জে শ্রীপতির মতো এত লেখাপড়া জানা লোক আর নেই। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যে জীবনে কিছু হয় না, ওই শ্রীপতি মাস্টার তার প্রমাণ। মাইনর স্কুলে সামান্য বেতনের মাস্টারি করে, আর গোমুখ্যু ভেলুরামের নাতি, গজমুখ্যু শোভারামের ছেলে আকাটমুখ্যু খেলারামকে রোজ সন্ধেবেলা দু-ঘণ্টা পড়িয়ে মাসকাবারে বুঝি পঞ্চাশ টাকা পায়। আর ওই দু-ঘণ্টায় ভেলুরাম গদিতে বসে না হোক শতখানেক টাকা নাফা রোজ ঘরে তুলছে।

BANGLADARSHAN.COM

—রাম রাম মাস্টারজি। বলে শোভারাম গদির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাবখানা এমন যে তারই গদি, রোজই সে এখানে যাতায়াত করে। কর্মচারীটা একবার মুখ গম্ভীর করে তাকাল। হাতের কাছেই ক্যাশবাক্স, কিন্তু ওতে কিছু নেই, শোভা জানে। থাকলেও ক্যাশবাক্স তালা-দেওয়া, আসল মালকড়ি লম্বা গেঁজের মধ্যে ভেলুরামের কোমরে প্যাঁচানো থাকে।

শ্রীপতি মাস্টার চিনতে পারল না, অন্যমনস্ক মানুষ। চুলগুলো সব উলোঝুলো, গায়ে ইস্তিরি ছাড়া জামা, ময়লা ধুতি। উদাস চোখে চেয়ে বলল—কোন হ্যায় আপ?

শ্রীপতি দারুণ হিন্দি বলে। প্রথম দিন খেলারামকে পড়াতে সে বড় বিপদে ফেলেছিল ভেলুরামকে। খটাখট উর্দু মেশানো চোস্ত হিন্দিতে কথা বলে যাচ্ছে, ভেলু হাঁ করে চেয়ে আছে, কিছু বুঝতে পারছে না। তিন পুরুষ বাংলা দেশে থেকে আর বাঙালির সঙ্গে কারবার করে-করে হিন্দি-মিন্দি ভুলে গেছে কবে! উত্তরপ্রদেশে সেই কবে দেশ ছিল। মা গন্ধেশ্বরী কিছু কিছু বলতে পারত। খেলারাম এখন ইস্কুলে হিন্দি শেখে।

শ্রীপতির হিন্দি শুনে ভয় পেয়ে শোভারাম বলে—আমি খেলারামের বাপ মাস্টারজি। আমার কথা ভুলে গেলেন আপনি?

—ও। বলে বিরস মুখে বসে থাকে শ্রীপতি। গঞ্জে থেকে তার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এমনকী সে যে এত ভালো হিন্দি জানে সেটুকু পর্যন্ত অভ্যাস রাখতে পারছে না, এমন লোকই নেই যার সঙ্গে দুটো হিন্দি বলবে।

আর যা সব জ্ঞান আছে তার সেগুলো তো গেলই চর্চার অভাবে। গবেট খেলারাম এমনই ছাত্র যে বাঁ বলতে ডান বোঝে। পড়তে বসে দশবার উঠে গিয়ে দোকানদারি করে আসছে। প্রতি ক্লাসে একবার দুবার ঠেক খেয়ে ক্লাস নাইনে উঠেছে। এর পরের চড়াই ঠেলে পার করা খুবই মুশকিল। তবু তার দাদু ভেলুরামের বড় ইচ্ছে যে খেলারাম বিকম পাস করে হিসেবের ব্যাপারটায় পাকা হয়ে আসুক। তাই শ্রীপতি মাঝে-মাঝে ঠেস দিয়ে বলে, বুদ্ধি কম হলে কি আর বিকম হওয়া যায়।

শোভারাম খুব বিনীতভাবে প্রশ্ন করে—একা বসে আছেন, খেলাটা গেল কোথায়?

শ্রীপতি মুখটাকে খাট্টা করে বলে—কোথায় আর যাবে, বাকি বকেয়ার তাগাদায় বীরপাড়া না কোথায় গেছে শুনছি। আমার আটটা পর্যন্ত টাইম, ততক্ষণ বসে উঠে যাব।

—সে তো ঠিক কথা। বলে শোভারাম একটু বাপগিরি ফলিয়ে বলে—খেলারামটা লেখাপড়ায় কেমন মাস্টারজি?

শ্রীপতি বলে—কিছু হবে না।

শোভারাম শুনে খুশিই হয়। বলে—আমিও তাই বলি। ঝুটমুট ওর পিছনে পয়সা গচ্চা যাচ্ছে।

বলতে-বলতে শোভারাম চারদিকে নজর করছে। হাতের কাছে সরাবার মতো কিছু নেই। শোভা তাই হাতের কাছে ক্যাশ বাক্সটায় একটু তেরে কেটে তাক বাজায় অন্যমনে। বয়স কম হল না তার। পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। খেলারামেরও না হোক বাইশ-চব্বিশ হবে। এত বয়স পর্যন্ত এ গদিতেই কেটেছে তার। কাঠের দোতলার ওপর সে জন্মেছিল বিন্দি ধাইয়ের হাতে। এই বাজারের ধুলোয় পড়ে বড় হয়েছে। ভিতরবাগে একটা উঠোন আছে, সেখানে মা গন্ধেশ্বরী আচার রোদে দিত, পাঁপড় শুকিয়ে নিত। কিন্তু এখন সে গদিতে বাইরের লোক। বাপ যে এত অনাত্মীয় হতে পারে কে জানত।

সন্ধে পার হয়ে গেল। ইটখোলার দিক থেকে পশ্চিমা গানের আওয়াজ আসছে। সাঁজবাজারে কিছু লোক নদীর মাছ কিনতে এসে বকবক করছে। তা ছাড়া বাজারটা এখন বেশ চুপচাপ। শীতটা সদ্য এসেছে, এবার জোর শীত পড়বে মনে হয়। গায়ের মোটা সুতির চাদরটা খুলে আবার ভালো করে জড়ায় শোভারাম। এইসব গায়ের বস্ত্র দিয়ে শীত আটকানোয় সে বিশ্বাসী নয়। শীত ঝেড়ে ফেলতে এক নম্বরীর চাপানের মতো আর কি আছে। না হয় একটা ছিলিম বোমভোলানাথ বলে টেনে বসে থাকো, মা গন্ধেশ্বরীর হাতে ঠেঙা খেয়ে চোর বেড়াল যেমন লাফিয়ে পালাত, শীতও তেমনি পালাবে।

বাপ ভেলুরামের নাগরা জুতোর শব্দ আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। সেটা শুনতে পেয়েই উঠে পড়ল শোভারাম। টালুমালু অসহায় চোখে চারদিকে আর-একবার তাকায়। কিছুই হাতাবার নেই। পাথরপোতার এক ব্যাপারী বাংলা সাবান কিনতে এসে বসে ঢুলছিল। জুতো জোড়া ছেড়ে রেখেছে বেঞ্চির সামনে। বেশ জুতো—ঝা চকচকে নতুন, না হোক ত্রিশ টাকা জোড়া হবে।

BANGLADARSHAN.COM

শোভারাম নিজের টায়ারের চটি আর পায়ে দিল না। দেখি-না-দেখি না ভাব করে ব্যাপারীর জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এল। একটা কাঠের বড় মুখ খোলা বাক্সে বিস্তর নোনতা বিস্কুটভরা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট। যাওয়ার সময়ে হাতপিছু করে দু-প্যাকেট তুলে চাদরের তলায় ভরে ফেলল। সেইসঙ্গে এক মুঠো তেজপাতা আর এক গোলা বাংলা সাবানও। যা পাওয়া যায়।

বাপ ভেলুরামের সঙ্গে মুখোমুখিই পড়ে যেত শোভা। কিন্তু একটুর জন্য বেঁচে গেল। ভেলু এখন সবজিবাজারের কাছে দাঁড়িয়ে নদীয়ার সঙ্গে কথা বলছে। জবুথবু কয়েকজন সবজিওয়ালা টেমি জ্বেলে নিঝুম বসে আছে আলু কপি বেগুন সাজিয়ে। ব্যবসা মানেই হচ্ছে বসে থাকা। তাই শোভারাম মানুষের ব্যবসা করা দু-চোক্ষে দেখতে পারে না। নতুন জুতো জোড়া বেশ টাইট মারছে। কয়েক কদম হাঁটলেই ফোসকা পড়ে যাবে। শোভারাম খুঁড়িয়ে মেছোবাজারের দিকে অন্ধকারে সরে যায়।

চটিজোড়া এই নিয়ে আটবার ছিঁড়ল। বাজারের ও-প্রান্তে দোকান, এখন বেশ খানিকটা দূর। নদীয়া ডান পায়ের চটিটা তুলে সবজিওয়ালার টেমির আলোয় দেখল। নতুন করে ছেঁড়েনি, রবারের নলী দুটো যেখানে ডিমসুতোয় বাঁধা ছিল সেই বাঁধনটাই ছিড়েছে। সুতোওয়ালারা আজকাল চোরের হদ্দ, এমন সব পচা সুতো ছেড়েছে বাজারে যে বাতাসের ভর সয় না। চটিটা আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীয়া। নাঃ, গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে আদ্দেক। আর-এক জোড়া না কিনলেই নয়। জুতো চটির যা দাম হয়েছে আজকাল। চটিটা ছেঁড়ায় ফের নিজেকে ভারী দুঃখী মানুষ বলে মনে হয় নদীয়ার। এ গঞ্জে তার মতো দুঃখী আর কে?

BANGLADARSHAN.COM

চামার সীতারামের দোকানটা সবজি বাজারের শেষে। দোকান না বলে সেটাকে গর্ত বলাই ভালো। একধারে লোহার আড়ত, অন্য ধারে ভূষি মালের দোকান। তার মাঝখানে বারান্দার নীচের দিকে একটা গর্ত মতো জায়গায় সীতারাম মুচির দোকান ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো। ছোট চৌখুপিটার মধ্যে চারধারে কেবল জুতো আর জুতো। সবই পুরোনো জুতো। সামনের দিকে বাহার করার জন্য আবার জুতোর সারি ঝুলিয়ে রেখেছে সীতুয়া। তার বউ নেই, বালবাচ্চার কথা ওঠে না। আছে কেবল পুরোনো জুতো। সেই জুতোর মধ্যেই সে দিনরাত শোয় বলে, সেখানেই রান্না করে খায়। পেল্লায় বুড়ো হয়ে গেছে সীতুয়া, তবু এখনও গর্তের ভিতর থেকে শকুনের মতো তাকিয়ে খদ্দেরদের দেখে নেয়।

ছেঁড়া চটিটা নিয়ে দোকানের মধ্যে কুঁজো হয়ে মুখ বাড়াতে গিয়ে কপালে ঝুলন্ত কার-না-কার পুরোনো জুতোর একটা ধাক্কা খেল নদীয়া। এমন কপালে জুতোই মারতে হয়। ইচ্ছে করেই নদীয়া কপাল দিয়ে আর-একবার ধাক্কা মারে ঝুলন্ন জুতোয়।

সীতুয়া ছেনির মতো যন্ত্র দিয়ে চামড়া কাটছে। কাঠের একটা ক্ষয়া টুকরোয় খসখস করে দু-চারবার ঘষে নিচ্ছে ছেনিটা। মুখ তুলতেই নদীয়া বলে—দ্যাখ বাবা, চটিটার একটা বন্দোবস্ত করতে পারিস কি না।

নদীয়াকুমার ভালো খদ্দের নয়, সীতারাম জানে। তাই গম্ভীরভাবে হাতের কাজ শেষ করে একবার খইনির থুক ফেলে হাওয়াইটা হাতে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলে—এ তো ভিখামাঙাদের চটি, আপনি কোথায় পেলেন এটা?

নদীয়া রেগে গিয়ে বলে—বড্ড বকিস বলেই চিরকাল এমন রয়ে গেলি সীতুয়া। দে দুটোর সুতো টান মেরে।

সীতারাম মাথা নেড়ে বলল—ফুটো হবে কোথায়? বিলকুল পচে গেছে রবার। ফিকে ফেলে দেন। নতুন কিনে নেন একজোড়া।

নদীয়া পকেটে হাত দিয়ে দেখল। জানা কথা পয়সা নেই। পকেটে থাকেও না কোনওদিন খরচের ভয়ে নদীয়া পয়সা নিয়ে বেরোয় না। মিনতি করে বলল—দে বাবা সারিয়ে, দোকানে গিয়ে পাঁচটা পয়সা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সীতুয়া তার যন্ত্র দিয়ে চটির রবার ফুঁড়ে সুতোয় টান দিয়ে বলল—দেখবেন নদীয়াবাবু জুতো মাথায় মুখে লেগে যাবে। অত ঝুঁকবেন না।

—লাগবে কী, লেগেছে। বিরস মুখে বলে।

সীতুয়া মোষের শিঙের ফুটোয় যন্ত্রটা ঢুকিয়ে বের করে এসে ভুসভুসে রবার ফুটো করতে-করতে বলে—বাবুলোকেরা মাথা নীচু করতে জানে না তো, তাই ওইসব জুতো তাঁদের কপালে লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

—এঃ, ব্যাটা ফিলজফার। বলে নদীয়া।

তারপর চটি পরে ফটাফট কাপ্তানের মতো হাঁটে।

দিনটাই খারাপ। খড়-কাটাই কলের সামনে নদীয়ার বউ দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটা আগে সহ্য হত না। আজকাল সয়ে গেছে। বউয়ের চেহারা দেখলে ভিমরি খেতে হয়। মাথায় টেরিকাটা পুরুষমানুষের চুল, পরনে পাঞ্জাবি-ধুতি, পায়ে চপ্পল, বাঁ-হাতে ঘড়ি। দাড়িগোঁফ নেই বলে খুবই ডেঁপো ছোকরার মতো দেখতে লাগে। চেহারাটা মন্দ ছিল না মেয়েমানুষ থাকার কালে। বুকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে চেপে বেঁধে রাখে, তাই এখন আর মেয়েমানুষির চিহ্ন কিছু বোঝা যায় না।

বউকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া নদীয়া। মুখটা অন্য ধারে ঘুরিয়ে নেয়। সেই ঘটনার পর বছর ঘুরে গেছে। একদিন মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছিল নদীয়া। সময় খারাপ পড়লে মানুষ স্বপ্নটাও ভালো দেখে না। তো সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই একটা লাথি খেয়ে জেগে উঠে হাঁ করে রইল। তার বউ মন্দাকিনী তার নাম ধরে ডাকছে—ওঠ, ওঠ রে নদীয়া! নদীয়ার মুখের মধ্যে একটা মশা ঢুকে পিনপিন করছিল, সেটাকে গিয়ে ফেলে নদীয়া ফের হাঁ করে থাকে। দেখে, বউ মন্দাকিনী মস্ত কাঁচি দিয়ে চুল সব মুড়িয়ে কেটে ফেলেছে, ঘরের মেঝেময় মস্ত-মস্ত লম্বা সাপের মতো চুলের গুছি। পড়ে আছে। নদীয়ার ধুতি পরেছে মালকোঁচা মেরে, গায়ে গেঞ্জি। তাকে জেগে উঠতে দেখে হাতের কাঁচিটা নেড়ে বলল—খবরদার আজ থেকে আর আমাকে মেয়েমানুষ ভাববি না। মা কালী স্বপ্ন দিয়েছে, আজ থেকে আমি তাঁর সাধক। নদীয়া তেড়ে উঠে বউয়ের চুলের মুঠি ধরতে গিয়েছিল,

কিন্তু সে আর ধরা হল না। চুল পাবে কোথায় ধরার মতো? তা ছাড়া বড় কাঁচিটা এমনধারা ঘোরাচ্ছিল যে খুব কাছে যেতে নদীয়ার সাহস হয়নি। সেই থেকে তার বউ মন্দাকিনী পুরুষমানুষ মেরে গেল। বাড়িতে থাকে, নদীয়ার পয়সাতেই খায় পরে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুমাত্র নেই। পড়শিরা ডাক্তার কবিরাজ করতে বলেছিল। সে অনেক খরচের ব্যাপার, তবু নদীয়া শশধর হোমিওপ্যাথকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু ওষুধ খাবে কে? সেই বড় কাঁচিটা অস্ত্র হিসেবে সবসময়ে কাছে-কাছে রাখে মন্দাকিনী। কাছে যেতে গেলেই সেইটে তুলে তাড়া করে। এখন ওই যে খড়কাটাই কলটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও ওর কোমরে পাঞ্জাবির আড়ালে কাঁচিটা গোঁজা আছে, নদীয়া জানে।

ব্যাটাছেলে মন্দাকিনীর দিকে যতদূর সম্ভব না তাকিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে যাচ্ছিল নদীয়া। সময়টা খারাপ পড়েছে। সীতুয়া চামার পাঁচটা পয়সার খয়রাতিতে ফেলে দিল। এখন এই হাওয়াইটা যদি ফেলে দিতেই হয়, আর নতুন একজোড়া কিনতেই হয়, তো এ পাঁচটা পয়সা না হক খরচা হল।

—এই নদীয়া! বউ ডাকল।

নদীয়া একপলক তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল তবু! মন্দাকিনী ফের হেঁকে বলল—শুনে যা বলছি, নইলে কুরুক্ষেত্র করব।

BANGLADARSHAN.COM

মেয়েমানুষের স্বভাব যাবে কোথায়! ঝগড়ার ভয় দেখাচ্ছে। তবু নদীয়া কান পাততে উৎসাহ পায় না। ফকিরচাঁদের ঢিবির ওপর নাকি মায়ের মন্দির তুলে দিতে হবে, মায়ের স্বপ্নাদেশ হয়েছে। প্রায়ই হয়। এসব কথা কানে তোলে কোন আহাম্মক!

মন্দাকিনী পিছন থেকে এসে পিরান টেনে ধরল, ঘন শ্বাস ফেলে বলল—তোরটা খাবে কে শুনি! ছেলে নেই, পুলে নেই, নিব্বংশ হারামজাদা, কবে থেকে মায়ের মন্দিরের জন্য দশ হাজার টাকা চেয়ে রেখেছি! রক্ত বমি হয়ে মরবি যে।

ফস করে নদীয়ার মাথায় বুদ্ধি আসে। বাঁই করে ঘুরে মুখোমুখি তাকিয়ে বলে—ছেলেপুলে নেই তো কি! হবে।

—হবে? ভারী অবাক হয় মন্দাকিনী। কাঁচির জন্যই বুঝি কোমরে হাত চালিয়ে দেয়।

—আলবাৎ হবে। সদরে মেয়ে দেখে এসেছি। বৈশাখে বিয়ে করব। দেখিস তখন হয় কি না হয়। তোর মতো বাঁজা কিনা সবাই।

এত অবাক হয় মন্দাকিনী যে আর বলার নয়। কাঁচিটা টেনে বার করতে পর্যন্ত পারে না। তার মুঠি আলগা হয়ে নদীয়ার পিরানের কোণটা খসে যায়। আর নদীয়া চটি ফটফটিয়ে হাঁটে।

না, নদীয়ার মতো দুঃখী আর নেই। দোকানে এসে দেখে ভেলুর অপদার্থ ছেলে শোভারাম চায়ের ভাঁড় হাতে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখেই নিজের দুঃখের ব্যাপকতা বুঝতে পারে নদীয়া। ওই যে চায়ের ভাঁড় ওর দাম

কখনও উসুল হবে না। গঞ্জের একনম্বর হেক্কোড় হল ওই শোভারাম। খাবে, খাতায়ও লেখাবে, কিন্তু কোনওদিন দাম শুধবে না। বেশি কিছু বলাও যায় না, কবে রাত-বিরেতে এসে দলবল নিয়ে চড়াও হয়।

বাবাকেলে পুরোনো তুষের চাদরটা গা থেকে খুলে সযত্নে ভাঁজ করে রাখল নদীয়া। পা ধুয়ে এসে ছোট্ট চৌকির ওপর বিছানায় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসল। টিকে ধরিয়ে পেতলের ধূপদানিতে ধোঁয়া করে অনেকক্ষণ গণেশবাবাকে প্রণাম ঠুকল। দুনিয়ার সব মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি হোক বাবা।

শীতে খদ্দের বেশি ভেড়ে না। দোকান ফাঁকাই।

নদীয়া ভারী দুঃখী মানুষ। ঠাকুর পেন্নাম ভালো করে শেষও হয়নি, শোভারামটা চটির খোঁটা দিল—ই কি গো, নদীয়াদা! তোমার চটির হালটা এরকম হল কবে? এ পরে বেড়াও নাকি? খবরদার রবারের চটি পরো না, চোখ খারাপ হয়। আর ওই কুকুরে খাওয়া চটি ভদ্রলোকে পরে?

শোভারামের পায়ে নতুন জুতো। নদীয়া আড়চোখে দেখে। বেশ বাহারি জুতো। চামড়ার ওপরে মাছের আঁশের মতো নকশা তোলা রংটাও ভালো। নদীয়ারই সময় খারাপ পড়ে গেছে। শ্বাস ফেলে বলে—নতুন কিনলি বুঝি জুতো জোড়া?

শোভারাম বিস্তর রংঢং দেখিয়ে বলে—ঠিক কেনা নয় বটে! শোভারাম ভেবে চিন্তেই বলে। কারণ, সে নিজের পয়সায় জুতো কিনেছে এটা নদীয়া বিশ্বাস নাও করতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

নদীয়া রসিকতা করে বলে—কিনিসনি! তবে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে পেলি? না কি শেষ অবধি জুতো চুরি পর্যন্ত শুরু করেছিস।

অপমানটা হজম করে শোভারাম। কিন্তু লোক চরিয়েই সে খায়, খামোকা চটে লাভ কী! ভালোমানুষের মতো বলে—না গো নদীয়াদা, সে সব নয়। গেল হপ্তায় বৈরাগী মণ্ডলের হয়ে সদরে একটা সাক্ষী দিয়ে এলাম। টায়ারের চটিটা ফেঁসে গিয়েছিল হোঁচট খেয়ে। তো বৈরাগী মণ্ডল জুতো জোড়া কিনে দিল। কিন্তু তখন তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি, মনে হচ্ছে এক সাইজ ছোট কিনে ফেলেছি! বেদম টাইট হচ্ছে। দ্যাখো তো, তোমার পায়ে লাগে কি না—

বলে শোভা জুতো খুলে এগিয়ে দেয়। নদীয়া উদাস হয়ে বলে—লাগলেই কী! ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়!

শোভারাম অভিমানভরে বলে—তুমি চিরকালটা একরকম রয়ে গেলে নদীয়াদা! তাই তো তোমার বউ ওরকম ধারা ব্যাটাছেলে হয়ে গেল! নাও তো, পরে দ্যাখো! পায়ে লাগলে এমনিই দিয়ে দেব। ত্রিশ টাকায় কেনা, তো সে কত টাকা জলে যায়। পরে দ্যাখো।

নদীয়া এবার একটু নড়ে। বলে—কত টাকা বললি?

শোভারাম হাসে, বলে–ত্রিশ টাকা। মূর্ছা যেয়ো না শুনে। ওর কমে আজকাল জুতো হয় না।

নদীয়া উঠে এসে জুতো জোড়া পায়ে দিল। পাম্প-শুর মতোই কিন্তু ঠিক পাম্প-শু নয়। বেশ নরম চামড়া। দু-চার পা হেঁটে দেখল নদীয়া। আরে বা! দিব্যি ফিট করেছে তো! এই শীতে পায়ে বড় কষ্ট। চামড়া ফেটে হাঁ করে থাকে, ভিতরে ঘা, তাতে ধুলোময়লা ঢুকে কষ্ট হয়। তা ছাড়া পাথরকুচির রাস্তায় অসমান জমিতে পা পড়লে হাওয়াই চটিতে কিছু আটকায় না, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়। এই জুতোজোড়া পরেই নদীয়া টের পেল আরাম কাকে বলে। পায়ে গলিয়ে নিলেই পা দুখানা ঘরবন্দী হয়ে গেল। ধুলোময়লা, পাথরকুচি কিংবা শীত কিছুই করতে পারবে না।

শোভারাম খুশি হয়ে বলে–বাঃ গো নদীয়াদা, জুতোজোড়া যেন তোমার জন্যই জন্মেছিল। আমাদের ছোটলোকি পায়ে কি আর ওসব পোষায়! তুমিই রেখে দাও। আমি না হয় একজোড়া টায়ারের চটি কিনে নেব। বাজারের ওদিকে মহিন্দির টায়ারের চটির পাহার নিয়ে বসে আছে।

নদীয়া একটু দ্বিধা করে বলল–টায়ারের চটি কি সস্তা নাকি রে? হলে বরং আমিও একজোড়া–

–আরে না-না! শোভারাম মাথা নেড়ে বলে–সে বড় শক্ত জিনিস। তোমরা পায়ে দিলে ফোস্কা পরে কেলেঙ্কারি হবে। কড়া আর জীবনে সারবে না। ওসব কুলিমুজুরের জিনিস। তুমি এটাই রেখে দাও। যা হোক, দশ বিশ টাকা দিয়ে দিয়ো, তোমার ধর্মে যা সয়।

BANGLADARSHAN.COM

সঙ্গে-সঙ্গে নদীয়া জুতোজোড়া খুলে ফেলে বলে–ও বাবা, বলিস কি সব্বোনেশে কথা, ডাকাত, কোথাকার! দশ বিশ টাকা পায়ের পিছনে খরচ! আমি আট টাকার ধুতি পরি।

শোভারাম অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে নদীয়ার দিকে তারপর খুব ধীরে বলে–তোমার লাভের গুড় পিঁপড়ে খাবে নদীয়াদা। ফৌত হয়ে যাওয়ার আগে নিজের আত্মাটাকে একটু ঠাণ্ডা করো। খাও না, পরো না, ও কীরকম ধারা রুগি তুমি? দুনিয়ার কত কী আরামের জিনিস চমকাচ্ছে–তুমিই কেবল নিভে যাচ্ছ।

নদীয়া না-না করে। আবার জুতোটা তার বড্ড ভালোও লেগে গেছে। ফের ছাড়া জুতো পায়ে পরে দেখে। বড় বাহার। আরামও কম কি! সেই কবে ছেলেবেলায় বাবা জুতো কিনে দিত, তখন পরেছে, নিজে রোজগার করতে নেমে আর বাবুগিরি হয়নি। বলল–দশ টাকা যে বড্ড বেজায় দাম চাইছিস রে!

–দশ কি বলছ? বিশ টাকা না হয় পনেরোই দিয়ো। সে-ও মাগনাই হল প্রায়। নেহাত জুতোজোড়া আমার ছোট হয়, আর তোমারও ফিট করে গেল। নইলে এখনও বাজার ঘুরলে বিশ পঁচিশ টাকায় বেচতে পারি।

–বারো টাকা দেব। ওই শেষ কথা। যা, ও মাসে নিবি।

হ্যা-হ্যা করে হাসে শোভারাম। বলে–বারো? তার চেয়ে এমনিই নাও না। ভেলুরামের ব্যাটা অনেক টাকা দেখেছে, বুঝলে নদীয়াদা।

সবশেষে তেরো টাকায় রফা হল। তাতে অবশ্য শোভারামের এক তিলও ক্ষতি নেই। যত তাড়াতাড়ি মাল পাচার করা যায়। নইলে বাংলা সাবান কিনতে আসা দোকানদারটা বাজারময় হাল্লাচিল্লা ফেলে দেবে। নগদ তেরো টাকা নিয়ে শোভারাম অন্ধকারে সাঁত করে মিলিয়ে গেল।

নদীয়া জুতোজোড়া লুকিয়ে ফেলল চৌকির পাশের ছায়ায়। বলা যায় না, শোভারাম শালা চোরাই মাল যদি গছিয়ে দিয়ে থাকে তো ফ্যাসাদ হতে পারে। থাক একটু লুকনো, নদীয়ার পায়ে দেখলে কেউ আর পরে সন্দেহ করতে পারবে না। দোকানের কর্মচারীটা ওদিকে বসে আগুন পোহাচ্ছিল, সব শুনেছে কি না কে জানে। নদীয়ার কোনও কাজই তো সহজপথে হয় না। সবই যেন কেমন রাহুগ্রস্ত। তার মতো দুঃখী, নদীয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আড়চোখে একবার জুতো জোড়া দেখে নেয়। মিটিমিটিয়ে হাসে। খুব দাঁও মারা গেছে। তবু তেরোটা টাকা...ভাবা যায় না। কর্মচারীটা আবার জুতো কেনার সাক্ষী থাকল না তো!

দুটো গেঁয়ো লোক এই সময়ে উত্তেজিতভাবে এসে দোকানে ঢুকল। রাজভোগ সিঙাড়া আর চায়ের অর্ডার দিয়ে খুব গরম স্বরে কথা বলতে লাগল। দুজনের একজনের জুতো চুরি গেছে ভেলুরামের গদি থেকে। তাই নিয়ে আলোচনা। যার জুতো চুরি গেছে তার পায়ে শোভারামের নোংরা টায়ারের চটিটা। কান খাড়া করে শুনছিল নদীয়া। যা ভেবেছিল তাই।

নদীয়ার মতো দুঃখী কমই আছে দুনিয়ায়। সে একটা শ্বাস ফেলে আড়চোখে জুতোজোড়া দেখে নিল। আছে।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীপতি সাড়ে সাতটায় উঠতে যাচ্ছিল, এ সময়ে দেখে, অন্ধকার ফুঁড়ে গরিলাটা গদিতে উঠে আসছে। বাইশ-তেইশ বছরের আই জোয়ান চেহারা, যেমন মাথায় উঁচু তেমনি পেল্লায় শরীর। এই হল তার ছাত্র খেলারাম।

চেহারা পেল্লায় হলে কী হবে, ইঁদুর যেমন বেড়ালকে ডরায় তেমনি মাস্টারজিকে ভয় পায় খেলা। মাস্টারজি সটাং-ফটাং ইংরিজি বোলি ছাড়ে। কষাকষ হিন্দি বলে, খেলা তার কিছু বোঝে না।

গরিলাটাকে দেখে ভারী বিরক্ত হয় শ্রীপতি। ঘড়ি দেখে বলে—মাই টাইম ইজ আপ খেলারাম। গুড নাইট।

গরিলাটা ভ্যাবলার মতো মুখ করে বলে—আজ্ঞে।

শ্রীপতি সন্দেহবশত বলে—কী বললাম বল তো!

খেলারাম গলার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলে অসহায়ভাবে দাদুর দিকে তাকায়। ভেলুরাম গদির ওপর বসে ছানিপড়া চোখে নাতির দিকে ভ্রূ কুঁচকে বলে—বল।

খেলারাম ঘামতে থাকে।

শ্রীপতি আনমনে বলে—কিছু হবে না।

গরিলাটার বাবা একটু আগে চোখের সামনে দিয়ে একজোড়া জুতো চুরি করে পালিয়ে গেল। একই তো রক্ত। মাথা নেড়ে শ্রীপতি বাজারে কুয়াশায় নেমে গেল। তার ভিতরে কত বিদ্যে গিজগিজ করছে, কাউকে দেওয়ার নেই।

আসতে-আসতেই শুনল, দাদু ফেলুরাম নাতি খেলারামকে খুব ডাঁটছে–কোথায় সারাটা দিন লেগেছিল চুহা কোথাকার! বীরপাড়া থেকে আসতে এত দেরি হয়! পঞ্চাশ টাকার মাস্টার বসে-বসে চলে গেল! জুতোচোরের ব্যাটা।

বাজারটা এখন নিঝুম কুয়াশায় মাখা, একটু খয়াটে জ্যোৎস্নাও উঠেছে। বাতাসে একটু আঁশটে গন্ধ পায় শ্রীপতি মেছোবাজার পেরোবার সময়ে। তখনও কিছু লোক নদীর টাটকা মাছ নিয়ে বেচবার জন্য বসে আছে কুপি জ্বালিয়ে। এইসব লোকেরা শেলি কিটস পড়েনি, শেক্সপিয়রের নামও জানে না। ডাস ক্যাপিটাল কিংবা রবি ঠাকুর কী বস্তু তা জানা নেই। আশ্চর্য তবু বেশ বেঁচে-বর্তে আছে। তবে কি ওসবই জীবনের বাহুল্য শৌখিনতা মাত্র। না হলেও চলে? সত্য বটে একবার একজন অধ্যাপক শ্রীপতিকে বলেছিলেন–ইনফর্মেশন মানেই কিন্তু জ্ঞান নয়। যে লোকটা টকাটক নানা ইনফর্মেশন দিতে পারে তাকেই জ্ঞানী মনে কোরো না, যার উপলব্ধি নেই, দর্শন নেই, সে বিদ্যের বোঝা বয় বলদের মতো।

উপলব্ধির ব্যাপারটায় একটু কোথায় খাঁকতি আছে শ্রীপতির, এটা সে নিজেও টের পায়। এই যে গঞ্জের পরিবেশ, ওই ম্লান একটু কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না, কিংবা ফকিরচাঁদের ঢিবিতে একা শিরীষের যে সৌন্দর্য এসব থেকে সে কোনও মানসাঙ্ক কষতে পারে না। বাইরের জগৎটা থেকে সে রস আহরণ করতে পারে না বটে মৌমাছির মতো, তবে সে বউয়ের জগতে তালেবর লোক। বিস্তর পড়াশোনা তার। তাকে টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ জন্মায়নি এখানে। লোকে তাকে ভয়ও খায়। তবু কি একটা খাঁকতি থেকে যাচ্ছে। সে কি ওই উপলব্ধি বা দর্শনের?

BANGLADARSHAN.COM

বাজার পার হয়ে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, একটু উপলব্ধির ব্যায়াম করা দরকার। সে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে গোঁয়ারের মতো চারধারের জ্যোৎনামাখা শীতার্ত প্রকৃতি থেকে সেই উপলব্ধির গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল।

হচ্ছে না। মনের পরদায় কিছুই ভেসে ওঠে না যে!

পাঁচ-সাতটা লোক হাল্লা-চিল্লা করতে-করতে কাছে এসে পড়ল। সবক'টা মাতাল। শ্রীপতি কিছু বুঝবার আগেই দলটা থেকে খেলারামের বাপ দৌড়ে এসে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলতে লাগল–রাম রাম মাস্টারজি, আমার খেলারামকে জুতো চুরির ব্যাপারটা বলবেন না। বাপকে তাহলে নীচু-জহরে দেখবে খেলারাম। অনেক পড়িলিখিওয়ালা ব্যাটা আমার, আমি মুখ্যুর ঢিবি–

–আহা, ছাড়ো ছাড়ো! বলে শ্রীপতি পা টেনে পিছিয়ে আসে।

বাতাস দূষিত করে মদের গন্ধ ছাড়তে-ছাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে শোভারাম বলে—এভাবে বাঁচা যায় মাস্টারজি? আমার বাপকে আর খেলারামকে একটু বলবেন, আমি সাফ-সুতেরো হয়ে গেছি। ভালো লোকের মতো থাকব, যদি আমাকে ফিরিয়ে নেয়।

নাকে রুমাল চেপে শ্রীপতি ঘাড় নাড়ল। পৃথিবীটা বড়ই পচা। দুর্গন্ধময়। এই পৃথিবী থেকে উপলব্ধি বা দর্শনের কিছু ছেঁকে নেওয়ার নেই। পুথিপত্রের মধ্যেই রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ।

লোকগুলো কোদাল গাঁইতি নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে শোভারাম হাতজোড় করে বলল—আশীর্বাদ করবেন মাস্টারজি। ফকিরচাঁদের ঢিবি খুঁড়তে যাচ্ছি আমরা, যেন কিছু পাই।

গম্ভীরভাবে শ্রীপতি বলে—হুঁ।

আজ পর্যন্ত বিস্তর হাঘরে ফকিরচাঁদের ঢিবিতে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। সকলেরই আশা, সাতঘড়া মোহর আর বিস্তর হিরে-জহরত একদিন ওখান থেকে বেরোবেই। পেল্লায় ঢিবি, খুঁড়ে শেষ হয় না। আজ পর্যন্ত সাপ-ব্যাঙ আর ইট-পাথর ছাড়া কিছুই বেরোয়নি। তবু অভাব পড়লেই কিছু লোক গিয়ে ঢিবিটা খুঁড়তে লেগে যায়।

নদীয়াকুমার তার দুঃখের কথা ভাবতে-ভাবতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে ফিরছিল। নতুন জুতোজোড়া পুরোনো খবরের কাগজে জড়িয়ে র‍্যাকপারের তলায় বগলসাই করে নিয়েছে। পায়ের পুরোনো হাওয়াই চটাস-পটাস শব্দ করে বোধহয় নদীয়াকেই গালমন্দ করছিল। করবেই। সময় খারাপ পড়লে সবাই করে ওরকম।

BANGLADARSHAN.COM

খুব একটা সাদাটে ভাব চারদিকে। কুয়াশায় জ্যোৎস্নায় যেন দুধে-মুড়িতে মাখামাখি হয়ে আছে। পাকা মর্তমানের মতো চাঁদ ঝুলছে আকাশে। পায়ের ফাটা জায়গাগুলোতে শীত সেঁধোচ্ছে। ভাল করে তুষের চাদরটায় মাথা মুখ ঢেকে হাঁটছিল নদীয়াকুমার। চৌপথীর কাছে বাড়ি, মাঝপথে ফকিরচাঁদের ঢিবিতে কারা যেন গোপনে কীসব করছে। দু-চারটে ছায়াছায়া লোকজন দেখা গেল নদীয়া কদমের জোর বাড়ায়। কোমরের গেঁজেতে বিক্রিবাটার টাকা রয়েছে। দিনকাল ভালো নয়। কপালটাও খারাপ যাচ্ছে। কেবল মাঝে-মাঝে নতুন জুতো জোড়ার কথা ভেবে এত দুঃখেও ফুক ফাক করে সখের হাসি হেসে ফেলছে নদীয়া। বেশ হয়েছে জুতোজোড়া। দিনদশ বাদ দিয়ে পরবে। চোরাই জুতো এর মধ্যে যদি খোঁজখবর হয় তো গেল তেরোটা টাকা। দামটা বেশিই পড়ে গেল। তবু জুতো একজোড়া দরকার। ভেলুরাম বলছিল বটে, বউকে জুতোতে হলেও তো একজোড়া জুতো লাগে। ছেঁড়া হাওয়াই চটি দিয়ে কি আর জুতোনো যায়?

বাড়ির দরজায় পৌঁছে ভয়ে আঁতকে ওঠে নদীয়াকুমার। কে একটা মেয়েছেলে ঘোমটা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের জবা গাছটার তলায়। মেয়েছেলে, নাকি ভূত-প্রেত। তার বাড়িতে আবার মেয়েছেলে কে আসবে?

নদীয়া বলল—রাম রাম, কে?

—আমি।

নদীয়া ফের আঁতকে উঠে বলে–কে আমি?

–আহা। বলে মেয়েছেলেটা এগিয়ে আসে তার কাছে। মুখে জ্যোৎস্না পড়েছে, ঊর্ধ্বমুখে তার পানে তাকাতেই ঘোমটা খসে গেল। পুরুষমানুষের মতো চুলওয়ালা মাথাটা বেরিয়ে পড়ল।

'আঁ, আঁ' করে ওঠে নদীয়াকুমার। এ যে মন্দাকিনী।

–তোমার এই সাজ? ভারী অবাক হল নদীয়া।

মন্দাকিনী জ্যোৎস্নায় চোখের বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলে–কেন, আমি মেয়েমানুষ সাজলে তোমার খুব অসুবিধে হয় বুঝি! সদরের কোন ডাইনিকে পছন্দ করে এসেছ, তাকে বৈশাখে ঘরে এনে ঘটস্থান করবে–তাতে বুঝি ছাই দিলাম; ঝ্যাঁটা মারি–

এইসব বলতে-বলতে মন্দাকিনী প্রায় নদীয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে আর কি টেনে হিঁচড়ে। কিন্তু তাতে নদীয়া কিছু মনে করে না। কপালটা কি তবে ফিরল! নতুন জুতো! বউ!

গহিন রাতে মন্দাকিনী শান্ত হয়ে কাঁদতে বসল। তার আগে পর্যন্ত বিস্তর বাসন আছড়ে, বিছানা ছুড়ে, জামাকাপড় ফেলে রাগ দেখিয়েছে। নদীয়া খুব আহ্লাদের সঙ্গে দেখেছে। বছরটাক আগে তো এরকমই ছিল মন্দাকিনী! এই রকমই অশান্তি করত।

BANGLADARSHAN.COM

মন্দাকিনী কাঁদছে দেখে নদীয়া বলে–কাঁদো কেন? ঝাল তো অনেক ঝাড়লে। আমি বড় দুঃখী লোক, কেঁদো না।

মন্দাকিনী জলভরা চোখে কটাক্ষ হেনে বলল–আমি এখন চুল পাব কোথায়? কত লম্বা চুল ছিলো আমার। তুমি কি এখন আর আমাকে ভালোবাসবে চুল ছাড়া!

–দূর মাগি! নদীয়া আদর করে বলে–চুলে কী যায় আসে!

ভোর রাত পর্যন্ত সাত মাতালে ঢিবি খুঁড়ে পেল্লায় হাঁ বের করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কার কোদাল যেন ঠং করে লাগল পেতলের কলসি বা ঘড়ার গায়ে। দ্বিগুণ উদ্যমে সবাই খুঁড়তে লাগে আরও। হ্যাঁ, সকলের কোদালেই ঠনাঠন ধাতুখণ্ডের আওয়াজ বেরোচ্ছে। জয় মা কালী। জয় মা দুর্গা। জয় দুর্গতিনাশিনী!

সাত মাতালের বুকের ভিতরে জ্যোৎস্নার ভাসাভাসি। সাত মাতাল এলোপাথাড়ি কোদাল গাঁইতি আর শাবল চালিয়ে যেতে লাগল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শোভারাম আর তার স্যাঙাতদের রাতও বুঝি কেটে গেল।

বেরোচ্ছে। বেরোচ্ছে। অল্প-অল্প মাটি সরে, আর বস্তুটা বেরোয়। কী এটা? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তবে ঘড়া বা কলসি নয়, তার চেয়ে ঢের-ঢের বড় জিনিস। ফকিরচাঁদের বসত বাড়িটা নাকি?

খোঁড়াখুঁড়ি চলতেই থাকে। হাতে ফোসকা, গায়ে এই শীতেও সপসপে ঘাম। কেউ জিরোতে চাইছে না। নেশা কেটে গিয়ে অন্যরকম নেশা ধরে গেছে।

ভোরের আবছা আলোয় অবশেষে বস্তুটা দেখা গেল স্পষ্ট। সাত মাতাল চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখে—একটা কবেকার পুরোনো রেলের মালগাড়ির পাঁজর আধখানা জেগে আছে মাটির ওপর; কবে বুঝি ডিরেইলড হয়ে পড়ে ছিল এইখানে। জংধরা লোহা হলদে রং ধরেছে।

কেউ কোনো কথা বলল না। হেদিয়ে পড়েছে।

খুব ভোরে খেলারামকে তুলে পড়তে বসিয়েছে ভেলুরাম।

খেলা দুলে-দুলে ইংরিজি পড়ছে।

গদির পাশ দিয়ে হা-ক্লান্ত, মাটিমাখা সাত মাতাল ফিরে যাচ্ছে; তাদের মধ্যে একজন শোভারাম, একটু দাঁড়িয়ে খেলারামের ইংরিজি পড়া শুনল। খুব জোর পড়ছে খেলা! ব্যাটা বোধহয় ভদ্রলোক হবে একটা! ভেবে এত দুঃখের মধ্যেও ফিক করে একটু হেসে ফেলল শোভারাম।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥